পরেশদার বাঁশী

সীমা দাস

প্রায় ৫৪ বছর আগেকার স্মৃতি। তবু সেই দিনটি আজও মনের আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল। পরেশ ধরের বাঁশী, আমাদের পরেশদা বাঁশী বাজাচ্ছিলেন।

নিস্পন্দ রাত, চারিদিক শুনশান। পুরোনো উল্টোডাঙার এক অখ্যাত ভাঙাচোরা গলি। রাস্তার দুপাশে বস্তি আর কাঠচেরাই কারখানা। সেই রাস্তায় একটি ত্রিতল বাড়ি। ছাদে পাতা হয়েছে মাদুর। আমার বাবা মার অনুরোধে পরেশদা বাঁশী বাজাচ্ছেন। ঘন নীল আকাশে ঝিকমিক তারা। রাগ নীলাম্বরী। শ্রোতা আমরা তিনজন।

তন্ময় হয়ে শুনছি। অনেকক্ষণ বাজালেন। বাঁশী থামলো। বাঃ বাঃ করে মাথা দোলাতে লাগলেন বাবা।* পরেশদার হাত চেপে বসে রইলেন অনেকক্ষণ।

টর্চ হাতে নিয়ে বাবা পরেশদাকে বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছোতে গেলেন।

সুর এমন হয়! অভিভূত আমি। সুরে আচ্ছন্ন। কানে কোনো কথা ঢুকছে না।

মা বললেন, পান্না কাকার কথা মনে পড়ছে। পান্নালাল ঘোষ, দূর সম্পর্কে মা'র কাকা। ভারতবিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষের বাড়ির কাছেই আমার মামাবাড়ি। তাই দিনের পর দিন তাঁর বাঁশী শোনার সুযোগ ছিল মা'র। তাঁর নিরলস রেওয়াজ ও ধ্যানমগ্নতার নানা ঘটনা আমি ছোট থেকে গল্পের মতো শুনেছি। বাবা ফিরতেই বার বার পান্নালালের কথা ওঁরা আলোচনা করছিলেন। বাবার মন্তব্যের একটি কথা আজও মনে আছে। "পরেশবাবু বাঁশী নিয়ে পড়ে থাকলে পান্নালালের স্তরে উঠতে পারেন। ভারতবিখ্যাত হবার সব যোগ্যতা ওঁর আছে"।

বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে বাবার মন্তব্য অগ্রাহ্য করা যায় না। নিয়মিত ওস্তাদদের আসরে যাওয়া, কনফারেন্স শোনা, তাঁদের সঙ্গ, আমন্ত্রণ করে তাঁদের বাড়িতে আনা ওঁর জীবনধারণের এক অঙ্গ ছিলো। রাগরাগিনী, তালপ্রকরণ ও সঙ্গীত সাধনা সম্পর্কে বাবার পরিচ্ছন্ন ধারণা ও অভিজ্ঞতা ছিলো। আসরে বাবার উপস্থিতি ওস্তাদদের উৎসাহিত করতো।

মা কালীপ্রসন্ন নট্ট ও ভারতবিখ্যাত সুরকার অনিল বিশ্বাসের ছাত্রী। মামাবাড়িতে নিয়মিত শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের আসর বসতো। সুতরাং তাঁদের মন্তব্য ফেলে দেওয়ার নয়। শিশু বয়সে না বুঝলেও বড় হয়ে তাঁদের কথার মর্ম উপলব্ধি করতে পেরেছি।

পরেশদার সঙ্গে আমাদের পরিবারের দৈনন্দিনের সম্পর্ক ছিলো। আমি নিয়মিত ওঁর কাছে স্কুলের পড়া করেছি, গান তুলেছি, গানের সুর করার সময় সুর সম্বন্ধে নাক গলিয়েছি, রাজনীতির আলোচনায় ডুবে থেকেছি কিন্তু এই নিয়মিত যাতায়াতের মধ্যে আমি কখনো তাঁকে রেওয়াজ করতে দেখিনি। কখনো কখনো সকাল থেকে রাত অবধি ওঁদের বাড়ি থেকেছি, কিন্তু বাঁশী নয়, কেবল গানই হতো। সলিল চৌধুরী, অমর মুখোপাধ্যায়, সুধীর বসু এবং আরও অনেকে আসতেন, আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকতো গান ও রাজনীতির মধ্যে। কিন্তু পরেশ দা যখন

* ধীরেন দাস, গণনাট্য সংঘের রাজাবাজার স্কোয়াডের প্রাণপুরুষ।

রেডিও প্রোগ্রাম করতেন আমরা বিস্ময়ে অবাক হয়ে যেতাম। অমন তীক্ষ্ণ সুরেলা স্বরনিক্ষেপ স্তম্ভিত করে দিত।

রেডিওতে পরেশ দা ধুন বাজাতেন। ঠুংরী শুনেছি বলে মনে পড়ে না। ওঁর এক একটা ধুনের প্রোগ্রাম যেন এক একটা সিম্ফনি। মালকোষ, ভৈরবী, দুর্গা, ভূপালি, হাম্বির প্রভৃতি রাগ শুনেছি বেশি। পাঁচ স্বরের ঔড়ব জাতির রাগ ওঁর বেশি পছন্দের। রাগের এক একটি ফেজের মধ্যে প্রবিষ্ট হয়ে উনি রাগরূপের সন্ধানে ডুব দিতেন। রাগের মধ্য থেকে বেরিয়ে আসতো মাটির সুর, লোকগীতির মাধুর্য। ধুনের অবাধ স্বাধীনতা আর স্বরমালিকার হাত ধরে বিভিন্ন রাগের অন্দর মহলে ঢুকে পড়তেন। স্বরের পারস্পরিক সম্পর্ক থেকে জন্ম নিতো স্বরের স্তবক, সুরের মালিকা। আলংকারিক ছুট ও কূটতানেও পরেশদা সিদ্ধহস্ত। সমগ্র রেডিও অনুষ্ঠানের ত্রিশ মিনিট শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতো তাঁর বাঁশী। রাগের বিশুদ্ধতা নয়, বিলম্বিত চলন নয়, এক শৃঙ্খলহীন স্বাধীনতার স্বাদ, সুরের উন্মোচন, স্বরের ফোয়ারা স্ফূর্তির মতো উপছে পড়ে তাঁর বাঁশীতে। কখনো স্বরগুলো ঝড়ের পাখীর মতো ছুটাছুটি করছে, কখনো ষড়জে এসে স্থির বিশ্রাম নিচ্ছে। পরেশদার বাঁশী ক্রিয়েটিভ, সৃষ্টির আনন্দে উদ্বেল, চঞ্চল, দুর্বার। শাস্ত্রীয় রাগ অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে স্বরের সঙ্গে মাতামাতি খেলা।

বড় হয়ে ওস্তাদ বিলায়েত খাঁর সেতারে ধুন শুনে পরেশদার কথা বারবার মনে হয়েছে। বিলায়েত খাঁর ধুনে ভিন্ন ভিন্ন রাগ অতিক্রম করে রাগের ভেতরের সুন্দর স্বরূপটি উন্মোচিত হয়। 'ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে' গানটির মুখ ধরে সেতার মুক্ত বিহঙ্গমের মতো সুরের আকাশে তারা ফোটায়। আবার তাঁর বাজনায় দেশজ মেঠোসুরের আভাস, কখনো বাংলার পল্লীগীতির মিষ্টিসুরের উঁকি, কখনো ছন্দের যাদুখেলা আমাদের মন কাড়ে। বাজনার ভিত শাস্ত্রীয়। শাস্ত্রীয় ধ্যানধারণা ও নিয়মরক্ষার এক অদৃশ্য শৃঙ্খল অনুভূত হয়। সুর বিস্তারে অসীম আনন্দ মানুষকে আহ্লাদিত করে। এখানেই তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতজ্ঞ। পরেশদা কিন্তু বেপরোয়া। মার্গ সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা তাঁর বাজনায়। বাজনা তার নিজস্ব স্বতন্ত্র প্রভায় দীপ্ত।

পরেশদার বাঁশী যখন প্রথম শুনি আমার বয়স তখন ১১ বছর হবে। প্রথম দিনের মুগ্ধতার রেশ এখনও বুকে বাজে। তাঁর প্রত্যেকটি রেডিও অনুষ্ঠান শুনেছি। তাঁর বাঁশী অন্যসব বংশীবাদকের চেয়ে আলাদা। স্বরের ওজন, তীক্ষ্ণতা, চলন, শুধু ছন্দময়ই নয়, রূপও অন্যরকম। স্বরগুলির ঘূর্ণীর মতো নৃত্যছন্দে এক সপ্তক থেকে আর এক সপ্তকে চলে যায়, তানের আলঙ্করিক প্যাটার্নও চূর্ণ হয় সৃষ্টির আনন্দে। এই দ্রুতগতির মধ্যেও কিন্তু তাঁর সুরবিচ্যুতি ঘটেনি। কারণ তাঁর শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রাথমিক ভিতটি ছিলো মজবুত। শ্রী রামকানাই ভট্টাচার্য'র মতো গুণী ছিলেন তাঁর শিক্ষাগুরু। মাত্র ১০/১২ বছরের নিয়মিত রেওয়াজ করেছেন। এই স্বল্প সময়ের মধ্যেই ওঁর সুরের টিপ আশ্চর্য রকমের সুরেলা। বাঁশী যেন ছবি আঁকছে। সে ছবির রঙ গাঢ়, নানা রঙের খেলা, তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রতিফলন। বাজনা পৌঁছে দেয় ছবির জগতে।

পরবর্তীকালের হরিপ্রসাদ চৌরাশিয়া বা বাংলার হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী শুনে পরেশদার সঙ্গে ওঁদের পার্থক্যটা মাথায় ঢুকে যায়। পান্নালাল ঘোষ হরিপ্রসাদ প্রভৃতিরা দিনে ১২/১৩

ঘন্টা রেওয়াজ করেছেন এবং আজীবন চর্চা থেকে বিরত থাকেন নি। এই নিরলস সাধনা, নিয়মিত বাজনা ওঁদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত জগতের শীর্ষে উঠতে সক্ষম করেছে। এঁরা সফল শিল্পী।

পরেশদার বাজনার প্রসাদগুণ, কল্পনাশক্তি, নতুন কিছু করার ক্ষমতা এদের চাইতে কোনো অংশে কম নয়। নিরলস রেওয়াজ ও শাস্ত্রীয় রাগ রাগিনীর ধ্যানে মগ্ন না থাকার ফলে তাঁর বাদন যতোটা সৃজনশীল ততটা শাস্ত্রীয় নয়।

বিশ্ববিখ্যাত উদয়শঙ্কর পরেশদার বাঁশী শুনে মুগ্ধ হন। বিশ্বপরিক্রমার পূর্বে মাদ্রাজে মহড়ার জন্য উনি দলে যোগ দেন। কয়েকমাস ধরে মহড়া চলে। নানাকারণে দলের নিয়মকানুন, পরিবেশ, ব্যবহার ইত্যাদি ওঁর স্বাধীনচেতা মনকে পীড়িত করে। ভারত পরিক্রমার পরই উনি দল ছেড়ে দেন।

ছায়া সিনেমা হলে উদয়শঙ্করের নৃত্যানুষ্ঠান দেখেছি। নৃত্য তো ভালো লেগেই ছিল। আমার কিন্তু মনযোগ ছিল পরেশদার দিকে। অর্কেস্ট্রার মধ্যের ফাঁক ফোকর উনি সুরের নকশায় ভরিয়ে দিচ্ছিলেন। প্রত্যেকটি যন্ত্রের সঙ্গে যেন মাল্যবন্ধন। অনবদ্য।

উদয়শঙ্করের দলে নিয়মিত বাঁশী বাজাবার ফলে পরেশদার বাঁশীর সুর আরও আকর্ষক হয়ে ওঠে। দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরে এসে ওঁর বাজনার শৈলী নতুন বাঁক নেয়। দক্ষিণীরাগ, তান প্রকরণ ও প্রয়োগ কৌশল সর্বোপরি দক্ষিণের লোকসঙ্গীতের প্রভাবে পরেশদার বাজনা অন্যরসে সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। আহীরভৈরো, শিবরঞ্জনী, কলাবতী, ইত্যাদি রাগ শুনে মোহিত হয়ে যেতাম। আমাদের কাছে তার কোনো রেকর্ড নেই।

কলকাতায় ফিরে উনি গণনাট্যের জন্য তরজা, পাঁচালী ও আরও সব গণসঙ্গীত রচনায় মেতে উঠলেন। বাঁশী বাক্‌সো বন্দী হলো।

বৃদ্ধ বয়সে টি ভি তে পরেশদার যে সাক্ষাৎকার প্রচারিত হয়েছিল, সেখানে উনি বাঁশীও বাজিয়েছিলেন। চমকে উঠেছিলাম। ছোটবেলার শোনা সেই অনুভূতির অনুরণন। সমস্ত সাক্ষাৎকারের মধ্যে ঐ বাঁশীর সুর আচ্ছন্ন করেছে, বলেওছিলাম। মৃদু হেসে উনি সমর্থন জানিয়েছিলেন। বাঁশী উনি কদাচিৎ বাজাতেন তবু ধ্বনি কি তীব্র সুরময়। এমন আশ্চর্য সুরেলা হাত কজনের? রেওয়াজ ছাড়াই মাত্র ৫ মিনিটের বাদন মন চুরি করে নেয়।

রাজনৈতিক চেতনা পরেশদাকে গণশিল্পী হবার উন্মাদনায় চালনা করেছে। মৃত্যুর শেষ দিন অবধি জনগণের বৈপ্লবিক চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য অন্যায়ের প্রতিকারের জন্য অপসংস্কৃতিকে রোখার জন্য ওঁর সৃষ্টি সোচ্চার।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ অবধি পরেশদার সঙ্গে আমার নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। এরপর দুবার দেখা হয়েছে। শেষ দেখা ২০০১ সালে। জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেছি বাঁশী ফেলে রাখার পেছনে কি মানসিক প্রক্রিয়া বা কোন্ যৌক্তিকতা ছিল?

দুঃখ এবং ক্ষোভ হয় পরেশদা কেন বাঁশীতে মগ্ন হলেন না। এর পেছনে যুক্তি যা-ই থাক আমরা কিন্তু হারিয়েছি একজন উচ্চস্তরের বংশীবাদককে। সে ক্ষতি বড়ো কম নয়। সে ক্ষতি কোন দলের নয়, সে ক্ষতি কোন বিপক্ষ মতাবলম্বীদের নয়। সে ক্ষতি নির্বিশেষে আমাদের সবার।